ধর্মগ্রন্থের স্বরূপ

২য় পর্ব

জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়

পূর্ববর্তী অংশের পর ...

খ্রিষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্বন্ধে বহুকাল ধরে যত গবেষনা এবং সমালোচনা হয়েছে, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থকে ঘিরে তা হয় নি। অতএব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বাইবেল-এর স্বরূপ বিশ্লেষন করা কঠিন। তাই এখানে অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোর মতো বাইবেল-এর স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এ প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন যে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে বাইবেল-এর ' ওলড টেষ্টামেন্ট ' অংশের (যা ইহুদি ধর্মের সংগে কমন) গুরুত্ব অনেকটা হিন্দু ধর্মের স্মৃতিশাস্ত্রের মতো-পবিত্র কিন্তু শ্রুতি বা প্রত্যাদেশ (revelation) নয়।' নিউ টেষ্টামেন্ট ' খ্রিষ্ট ধর্মে শ্রুতির পর্যায়ে পড়ে, তার মধ্যে মূল অংশ হলো-মার্ক, জন, ম্যাথিউ ও লুকের আলাদা আলাদা বিবরন অনুযায়ী যিশুর জীবন ও বাণী সম্বলিত চার পবিত্র ধর্মকাহিনী (four gospels)। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রধানত এই চার কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মধ্যযুগে খ্রিষ্ট ধর্মের পুরোহিত শ্রেনীর পান্ডিত্য সীমাবদ্ধ ছিল বাইবেল-এর প্রত্যাদেশ রূপকে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে আপন করে নিয়ে তার অভ্যন্তরে বিভিন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ, কিংবা কোন অলৌকিক ঘটনার তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে বিতন্ডা। বিশ্বাসী পন্ডিতদের এই চুলচেরা বিতন্ডাকে বলা হতো স্কলাস্টিসিজম বা পন্ডিতগিরি। কিন্তু ইউরোপে রেনেসাঁস এবং রেফরমেশনের পরে যে যুক্তিবাদী বা র‍্যাশনালিস্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠে, তার প্রভাবে যিশু খ্রিষ্টের জীবন ও বাণী সম্বলিত চার ধর্মকাহিনীর '' উচ্চতর সমালোচনা '' (Higher criticism) আরম্ভ হয়। ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) বাইবেল-এর ঈশ্বরকে অস্বীকার করে ঈশ্বরতত্ত্বকে একটি যুক্তিবাদী দর্শনের সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেন। যিশুর সমস্ত মিরাকল বা অলৌকিক কার্যকলাপ তিনি যুক্তিবিরুদ্ধ বলে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন যে ঈশ্বরকে বাইবেল-এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র যুক্তিপুর্ন দার্শনিক মননের মধ্যেই তাঁকে সন্ধান করতে হবে। এভাবে মানুষ যখন মননের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তারা বাইবেলকে বর্জন করবে। ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) বলেন যে বাইবেল এর সংগে যুক্তি ও দর্শনের মিল নেই। তারা দুটি আলাদা জগতের জিনিষ। তাছাড়া বাইবেল কে বা কারা লিখেছিল, কবে লিখেছিল, কেন লিখেছিল, কে বা কারা সবগুলো কাহিনী এক সংগে সংকলিত করেছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে তিনি বিশ্বাসীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেন। অনেকটা প্রকৃতিবাদী (naturalist) দৃষ্টিভংগী নিয়ে স্পিনোজা বলেন যে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ঈশ্বর। জীবজগত সহ মহাবিশ্বের সর্বত্র শুধু প্রকৃতি নামক একটি বস্তুই বিভিন্ন রূপে বর্তমান, এই প্রকৃতিই ঈশ্বর। তার এ সব বক্তব্যের জন্য একবার ১৬৫৬ সাল এবং আরেকবার মৃত্যুর পরে ১৬৭৮ সালে তাকে ইহুদি ধর্ম থেকে বহিস্কার করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আর যাদের রচনা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে বাইবেল-এ বিশ্বাসে উপর আঘাত হেনেছিলো, তাদের মধ্যে আছেন টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), জন লক (১৬৩২-১৭০৪), এবং জন মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪)। আঠারো শতকে ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে, যে জ্ঞানবাদী আন্দোলন (Enlightment) গড়ে উঠেছিল, দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪), হেলভিশিয়াস

(১৭১৫-১৭৭১), ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) প্রমুখ সে আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতারা বাইবেল তথা খ্রিষ্ট ধর্মকে যুক্তি এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষনের সাহায্যে নস্যাৎ করার চেস্টা করেন। তাছাড়া ইংল্যান্ডে ডেভিড হিউম (১৭৭১-১৭৭৬) তার যুক্তিবাদ ও প্রয়োগবাদের (positivism) এর মাধ্যমে শাস্ত্রীয় খ্রিষ্টীয় ধর্মের ভিত নড়িয়ে দেন। জার্মানিতে ইমানুয়েল কানট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর critique of pure reason গ্রন্থে দেখান যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমান নেই, যদিও তিনি তাঁর critique of practical reason গ্রন্থে ঈশ্বরে বিশ্বাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব স্বীকার করেন।

এই যুক্তিবাদী প্রবাহের ফলস্বরূপ উনিশ শতকে যিশুর জীবন কাহিনীকে '' নিউ টেস্টামেন্ট ''-এ বর্ণিত সমস্ত অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে একজন আদর্শ লৌকিক মানুষের জীবন হিসেবে দেখাবার কিছু চেস্টা করা হয়। পলাস (paulus) ১৮২৮ সালে একটি যিশুচরিত রচনা করেন, যাতে তিনি যিশুর অলৌকিক জন্ম, জীবনের সমস্ত অলৌকিক কার্যকলাপ, এবং পুনর্জ্জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে আসবার কাহিনীকে অসত্য এবং অবিশ্বাস্য বলে ঘোষনা করেন। আরেকটি বিখ্যাত উদাহরন রেনান বা রঁন্যার (১৮২৩-১৮৯২) life of jesus (১৮৬৩), যেখানে তিনি একই পদ্ধতিতে সমস্ত অলৌকিকতা বর্জন করে যিশুকে একজন সাধারণ কিন্তু আদর্শ মানুষ হিসেবে দেখাবার চেস্টা করেন। জার্মানীর টুবিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষকেরা ও (Tubingen School) অলৌকিকতা বর্জিত যিশুকাহিনী প্রচার করেন। কিন্তু এভাবে যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র রূপে গন্য করতে অস্বীকার করা, এবং '' নিউ টেস্টামেন্ট ''- এর কাহিনীগুলোকে অসত্য বলে ঘোষনা করা ছিল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বাইবেলের মূলে কুঠারাঘাত করবারই সমান। আবার অন্যদিকে ডেভিড স্ট্রাউস (১৮০৮-১৮৪৭) এবং ব্রুনো বয়ার (১৮০৯-১৮৮২) প্রমুখ ' ইয়ং হেগেলিয়ান '- রা '' নিউ টেস্টামেন্ট ''-কে সম্পুর্ন নকল করা এবং বানানো ধর্মগ্রন্থ রূপে দেখাবার চেস্টা করেন। বিশেষত ব্রুনো বয়ার দেখাতে চেস্টা করেন যে '' নিউ টেস্টামেন্ট ''-এর প্রায় সবই আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদি দার্শনিক ফাইলো এবং রোমক দার্শনিক সেনেকার কাছ থেকে নেয়া। তিনি ফাইলো কে খ্রীষ্ট ধর্মের পিতা এবং সানাকা-কে কাকা রূপে চিহ্নিত করেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এংগেলস খ্রিষ্ট ধর্মের উৎপত্তির বস্তুবাদী বিশ্লেষন করে বাইবেল-এর জাগতিক ও ঐতিহাসিক উৎস উন্মোচিত করেন। বিংশ শতাব্দীতেও বাইবেল-এর সমালোচনা থেমে নেই। অ্যালবার্ট শোয়াইটজার ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত তার Quest of the Historical Jesus গ্রন্থে যিশুর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীতে কার্ল লুডউইগ স্মিড দেখাতে চেস্টা করেন যে মার্ক-এর যিশু কাহিনীটিই প্রথমে রচিত এবং এটি ছিলো বহুলাংশে কল্পিত। এরই অনুকরনে পরবর্তী কালে লুক, ম্যাথিউ, এবং জন অন্য তিনটি কাহিনী রচনা করেন, এবং এর কোনটিই বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরন নয়। এই গবেষনা এবং সমালোচনা ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বিশেষত ১৯৪৭ সালে ডেড সি হ্রদের ধারে কামরান অঞ্চলে প্রাচীন ইসিন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুঁথিগুলো আবিষ্কারের পর থেকে বাইবেল গবেষনা আরও জোরদার হয়েছে। এ সবের গভীরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। আমরা এখানে শুধু যিশু কাহিনীগুলো সম্বন্ধে বিশষজ্ঞদের কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

প্রথমত, ঈশ্বরের পুত্র রূপে যিশুর অলৌকিক জন্ম, অসংখ্য অলৌকিক কার্যকলাপ, ক্রুসে মৃত্যুর মাধ্যমে মানব জাতির উদ্ধার, কবর থেকে পুনরুত্থান প্রভৃতির কাহিনী বৈজ্ঞানিক গবেষনার ধোপে টেকে নি। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয়েছে যে প্রাচীন মিশর্ ব্যবিলনিয়া, সিরিয়া এবং গ্রিসের ওসিরিস, তাম্মুজ, অ্যাডোনিস, অ্যাটিস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি কল্পিত উদ্ধারকর্তা দেবতার অতিকথার মধ্যে যিশুকাহিনীর উৎস নিহিত রয়েছে। যিশুর ক্রুসে মৃত্যু ও পুনরুত্থান সে সব প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক (এলিউসিনীয় রহস্যমালা বা Eleusinian Mysteries) এবং অন্যান্য প্রাচীন '' রহস্য'' থেকেই গড়ে উঠেছে যেখানে সূর্য, শস্য, মানুষ প্রভৃতির মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের নাটকীয় কল্পনা এবং অতিকথা তৈরী হয়েছিল। মেরী চরিত্রের উৎস মিশরীয়

আইসিসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে। ইস্টার, ক্রিসমাস প্রভৃতি উৎসব সহ প্রায় সব খ্রিস্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই প্রাচীনতর অখ্রিষ্টান (Pagan) ধর্মগুলোর মধ্যে পাওয়া গেছে। আদি পাপের তত্ত্ব এবং একেশ্বরবাদ ইহুদিদের কাছ থেকে নেয়া। কোন কোন পন্ডিত এই মত প্রকাশ করেছেন যে যিশু চরিত্র প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতর সূর্যদেবতার রূপক মাত্র, বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। দ্বিতীয়ত, কতগুলো অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রমান হয়েছে যে চারটি যিশু কাহিনীই সম্ভাব্য জীবনকালের অনেক পরে রচিত। যিশু যদি সত্যিকারের ঐতিহাসিক মানুষ হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সমকালে যেসব বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ও তাঁর কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে সেন্ট আইরেনিয়াসের লেখাতেই সর্বপ্রথম যিশুর সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সব গ্রিক প্যাপিরাসের ভিত্তিতে চার যিশু কাহিনী সংকলিত হয়েছিলো, সেগুলো এক সংগে এক জায়গায় পাওয়া যায়নি। নানা জায়গা থেকে অনেকগুলো টুকরো জোগাড় করে প্রায় ইচ্ছেমতো সংকলিত করা হয়েছে। তাছাড়া অস্টম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত খ্রিষ্টীয় শিল্পকলায় কোথাও ক্রসবিদ্ধ যিশুর প্রতিমুর্তি পাওয়া যায় নি। অনেক গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাচীনতর অতিকথাগুলো থেকে ক্রমশ যিশু চরিত্র গড়ে তোলা হয়েছে, এবং প্রধানত খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে যিশু কাহিনী লেখা হয়েছে। যারা এগুলো রচনা করেছিলেন তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ছিলো না। বার বার সংশোধনের এবং পরিমার্জন সত্ত্বেও বিভিন্ন যিশুকাহিনীর মধ্যে অনেক পার্থক্য এবং স্ববিরোধ থেকে গেছে(১)। তৃতীয়ত, যিশুকাহিনীগুলোর মধ্যে উচ্চ নীতিবোধে সমৃদ্ধ অনেক বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও সমাজের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সপক্ষে কোন বক্তব্য নেই। সিজারের পার্থিব রাজ্যের প্রদেয় তাকে দিয়ে তারপর ঈশ্বরের রাজ্যের প্রদেয় ঈশ্বরকে দিতে জনগণের প্রতি যিশুর নির্দেশ সর্বজনবিদিত। তাছাড়া যিশুর প্রবচনে দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা থাকলেও অন্তত তিনটি কাহিনীতে ধনী-দরিদ্রের অসাম্যকে সমর্থন জানানো হয়েছে (**ম্যাথিউ ১৩/১২, ২৫/২৯; মার্ক ৪/২৫; লুক ৮/১৮, ১৯/২৬**)। ক্রীতদাসের মুক্তির কোন উল্লেখ নেই। প্রকৃত পক্ষে আদি খ্রিষ্ট ধর্মে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে কোন কথাই নেই, যদিও সে অমানবিক প্রথা সে সময়ে রোমান সম্রাজ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো। এই ভিত্তিতেই সেন্ট পল মালিকের বাড়ী থেকে তার কাছে চলে আসা ক্রীতদাসকে মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পন করতে বলেছিলেন আর পরবর্তী কালে সেন্ট অগাস্টাইন বলেছিলেন যে দারিদ্র আর দাসত্ব আদি পাপ এবং পুঞ্জীভূত পাপের ফল। অতএব বাইবেল এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস এবং নিপীড়িতদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব ফেললেও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে এবং পুরোহিত শ্রেনীর সহায়তায় রক্ষিত, পরিবর্তিত ও প্রচারিত হয়েছিলো, এ সিদ্ধান্তই যুক্তিসম্মত(২)।

কোরান শরীফে লেখা আছে যে এই ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কাছে একটি ফলকে রক্ষিত বৃহত্তর ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রত্যাদেশ রূপে হযরত মোহাম্মদের কাছে নেমে এসেছিলো। এই ধর্মগ্রন্থের সুরা এবং আয়াতগুলো নেমে এসেছিলো দেবদূত জেব্রাইলের মাধ্যমে, এবং সেগুলো সংগে সংগে হযরত মোহাম্মদের অনুগামীরা মুখস্ত করে ফেলে পরে চামড়া, হাড় বা পাথরের উপর লিখে রেখেছিলেন। এভাবে তেইশ বছর ধরে মক্কায় এবং মদিনায় নেমে আসা সুরাগুলোর সংকলনই কোরান শরীফ। কোরান অন্যান্য কিছু ধর্মগ্রন্থের মতো কল্পিত নয়। কিন্তু তথাপি অলৌকিক ভাবে অবতরনের মূল সমস্যা ছাড়াও ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কোরান-এ কিছু মৌলিক সমস্যা নিহিত আছে। প্রথমত, হাদীস শরীপফেও (যা সম্ভবত হিন্দুধর্মের স্মৃতির পরম্পরার সংগে তুলোনীয়) হযরত মোহাম্মদের অনেক প্রবচন আছে, যে গুলোকে প্রত্যাদেশ রূপে গন্য করা হয় না বলে কোরান-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয়ত কোরান-এ কয়েক জায়গাতে লেখা আছে যে প্রত্যাদেশ ভুলে যাওয়া সম্ভব। অতএব সবগুলো প্রত্যাদেশ কোরান-এ নাও থাকতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক কোরান বিশেষজ্ঞের মতে অন্তত একটি ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মদ প্রথমে যাকে প্রত্যাদেশ বলে ঘোষনা করেছিলেন, কিছুকাল পরে তা আবার প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কাহিনীটি এই যে মক্কার বড় ব্যবসায়ীরা যখন হযরত মোহাম্মদের বিরোধিতা করছিলেন এবং তিনি ভাবছিলেন কি ভাবে এদের ইসলাম ধর্ম গ্রহন করানো যায়,

তখন তিনি এই প্রত্যদেশ পান যে এই ব্যবসায়ীদের দ্বারা পূজিত তিন দেবী (যাদের মন্দির মাক্কার কাছেই ছিলো) বিশ্বাসীদের মৃত্যুর পরে তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারেন। এই প্রত্যাদেশ শোনাবার পর সেই ব্যবসায়ীরা তাঁর অনুগামী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে দেবদূত জেব্রাইল মোহাম্মদ কে বলেন যে এই প্রত্যাদেশ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তান তাঁর মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখন এই প্রত্যাদেশ সুরা ৫৩ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় (৩)। এভাবে পরে বাদ দেয়া আয়াতগুলোকেই '' শয়তানের পদ্য '' বা Satanic Verses বলা হয়ে থাকে। সলমান রুশদি এই উৎস থেকেই অত্যন্ত বিকৃত কল্পনার ভিত্তিতে তার এই নামের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরিশেষে উল্লেখ্য, হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে তাঁর শ্বশুর এবং প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান সংকলন করবার প্রথম উদ্যেগ গ্রহন করেন। পরবর্তী খলিফা ওমরের সময়ে এ কাজ চলতে থাকে। তৃতীয় খলিফা উথমানের সময়েও নাকি কোরান-এর বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা ভাষ্য প্রচলিত ছিলো। কোন কোন পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত কোরান প্রকৃত পক্ষে আগেকার অনেক বিভিন্ন ভাষ্য থেকে নবম শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছিলো, এবং তার পরেও কিছুটা সংশোধিত হয়েছে(৪)।

কোরান-এর দ্বিতীয় সুরা থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি সুরাতেই বহুসংখ্যক এবং নানাধরনের অবিশ্বাসীদের উল্লেখ, তাদের বিভিন্ন যুক্তি এবং তাদের ভয়াবহ পরিনতীর সাবধানী উচ্চারিত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় হযরত মোহাম্মদ জীবিত কালে বহু মানুষ রসুল হিসেবে তাঁকে, এবং আল্লাহর বাণী হিসেবে কোরান-এর আয়াতগুলিকে গ্রহন করে নি। দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ সুরার প্রথম আয়াতটি স্পষ্ট বলছে যে কোরান-এর আয়াতগুলো আল্লাহর বাণী রূপে অবতীর্ণ হয়েছে, এ কথা অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না (**কোরান শরীফ, ৬/১**)। অন্যত্র আরেকটি আয়াতে অনুযায়ী অনেক মানুষ হযরত মোহাম্মদকে বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও (**কোরান শরীফ, ৬/৪৯**)। আবার অন্য একটি আয়াতে আছে, অবিশ্বাসীদের এক অংশ বলে যে কোরান-এর আয়াতগুলো পৌরানিক উপকথা মাত্র (**কোরান শরীফ, ৬৮/১৫**)। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে হযরত মোহাম্মদ বাইবেল-এর ইহুদি ধর্মের অতিকথাগুলো মেনে নিয়েছিলেন, এবং কোরান-এ বারবার আদম, নোয়াহ, মুসা, ইসরাইল, ইব্রাহিম প্রভৃতির বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। এভাবেই কোরান-এর আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় যে আল্লাহর বাণী সম্বলিত ধর্মগ্রন্থ রূপে কোরান হযরত মোহাম্মদের জীবদ্দশায় আরব দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্বীকৃতি পায়নি। আবার হযরত মোহাম্মদের সাফল্য দেখে তাঁর জীবিতকালেই আরো তিন জন প্রভাবশালী লোক আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের আল্লাহর রসুল বলে ঘোষনা করে, এবং '' আল্লাহর বাণী '' প্রচার করে বহু সংখ্যক অনুগামী সংগ্রহ করতে ও সমর্থ হয়। হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে আবু বকর যুদ্ধ করে একের পর এক এদের সবাইকে পরাস্ত করার পরই হযরত মোহাম্মদ আল্লাহর একমাত্র শেষ রসুল বলে স্বীকৃতি পেতে থাকেন (৫)।

গ্রিক বিজ্ঞান-দর্শনের গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় অনূদিত এবং প্রচারিত হবার পর অষ্টম - নবম শতাব্দীতে মুক্তচিন্তায় উদবুদ্ধ হয়ে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মুসলিমরা কোরান- এর অলৌকিকতা অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে কোরান মানুষের রচনা, আল্লাহর প্রত্যাদেশ নয়। আর হযরত মোহাম্মদের মতো স্থুল দেহবিশিষ্ট রক্তমাংশের মানুষের পক্ষে আকাশ ভেদ করে আল্লাহর সংগে কোরান-এ বর্ণিত সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলে ঘোষনা করেন। তাছাড়া কোরান- এ আল্লাহর বিভিন্ন বর্ণনা অস্বীকার করে বলেন যে আল্লাহ নিরাকার, নির্গুন, এবং অনন্ত কালই (Eternity) তাঁর একমাত্র লক্ষন। পাপীদের ঈশ্বর কর্তৃক বিপথে চালনা, এবং নরকে শাস্তি দেবার তত্ত্বকে ও তারা অযৌক্তিক বলে ঘোষনা করেন। কয়েকজন খলিফা মুতাজিলাদের এ ব্যাপারে সমর্থন করেন, এবং কিছু কাল শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে মুতাজিলারাই ধর্মের ব্যাখ্যায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্টায় সমর্থ হয়েছিলেন (৬)। তারপর অবশ্য মুতাজিলারা মৌলবাদীদের প্রতিআক্রমনের পর্যুদস্ত হন।

কিন্তু পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্মের সুফী সম্প্রদায় আবার কোরান-এর সুরা ও আয়াতগুলিকে আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে রূপক হিসাবে গ্রহন করেন, এবং আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে এক মরমীয়া চিন্তাধারা ও প্রকৃয়া গড়ে তোলেন। মধ্যযুগের ইসলামে এদের গভীর প্রভাব ছিলো। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে উঠা আহমদীয় সম্প্রদায়ের মুসলিমরা নিজেদের সাচ্চা মুসলিম বলে ঘোষনা করলেও কোরান-এর এই উক্তি মানেন না যে হযরত মোহাম্মদই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী। তারা হযরত মিরজা গুলাম আহমদকে (১৮৩৫-১৯০৮) আল্লাহর পরবর্তী রসুল হিসেবে গন্য করেন।

কোরান মূলত হাম্মুরাবির অনুশাষন কিংবা মনুস্মৃতি-র মতো মানব জীবনের এবং সমাজের সব ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অনুশাষনের সংহিতা রূপে রচিত। কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে কোরান পাঠ করলে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে একমাত্র পৌত্তলিক, অংশীবাদী এবং নাস্তিকদের ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, নির্ভেজাল একেশ্বরবাদ, ধর্মের কুজঝটিকাহীন সরলতা, এবং সর্বোপরি সামাজিক সাম্যের দিক থেকে কোরান পৃথিবীর অন্য যে কোন ধর্মগ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশেষত মনুস্মৃতি ও ভগবদগীতা যে গভীর আর্থসামাজিক অসাম্যের ঐশ্বরীয় সমর্থনে কলুষিত, তার বিপরীত মেরুতে ধর্মগ্রন্থ রূপে কোরান-এর অবস্থান। আর বেদের নির্ভেজাল ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রার্থনার পরিবর্তে কোরান-এ বারংবার পাই সমাজের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এ কারণেই ইসলাম ধর্ম সমকালীন আরবের অনুন্নত এবং বহুধা বিভক্ত উপজাতিগুলোকে সহজে এক করে শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপনের সহায়ক হতে পেরেছিলো এবং বিপুল শক্তিতে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে সমর্থ হয়েছিলো।

কিন্তু আমরা বর্তমানে যথাক্রমে মহাবিশ্বের বিবর্তন এবং মানুষ ও তার তার সভ্যতার বিবর্তনের চিত্র পাচ্ছি, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কল্পিত অলৌকিকতার মতোই কোরান-এর অলৌকিকতা তার সংগে সংগতিহীন। কোরান-এর প্রত্যাদেশিত রূপ, স্বর্গের সিংহাসনে বসে আল্লাহ দ্বারা মৃত মানুষের বিচার, স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা, দেবদুত-ফেরেশতা- হুরীতে বিশ্বাস, আসন্ন কেয়ামতের দিনের এবং নরক যন্ত্রণার ভয়াবহ বর্ণনা, পৃথিবীর সব মৃত মানুষের কেয়ামতের দিনে উঠে আসবার ভবিষ্যদ্বাণী, অবিশ্বাসীদের প্রতি বারংবার সতর্কবানী প্রভৃতি কোরান-এর অনেক মৌল বক্তব্যই মহাবিশ্ব, পৃথিবী ও মানব সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগীর পরিপন্থী। অতএব অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো কোরান-কে আমরা একটি দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে জাগতিক প্রয়োজনে রচিত ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই দেখবো।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে উপরের আলোচনা থেকে আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে সব ধর্মগ্রন্থই দেশকালের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রয়োজন থেকে উদভূত হয়েছিলো, অলৌকিক উৎস থেকে নয়। বিশেষত, উপজাতি প্রধান সমাজে যখন বৃহত্তর ঐক্য এবং রাষ্ট্র নির্মানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, তখনই এই ঐতিহাসিক-জাগতিক প্রয়োজন মেটাবার অন্যতম উপায় হিসেবে বৃহত্তর জনগোষ্টীতে গ্রহনযোগ্য সমন্বয় ধর্মী ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম রচিত হয়েছিলো। আর এই ঐতিহাসিক-জাগতিক কারণেই এক সময় বর্তমানে প্রচলিত ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগুলো গড়ে উঠেছিলো। ধর্মগ্রন্থগুলোই ছিলো বিভিন্ন ধর্মের ভিত্তি এবং মূল পরিচয়। মানুষের বিবর্তনের কষ্টিপাথরে বিচার করে সহজেই বলা যায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে মানব সমাজ ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর ঐক্যের পথে এগুবে, এবং তখন এসব ধর্মগ্রন্থ আর তাদের উপর দাড়িয়ে থাকা সংগঠিত ধর্মগুলোও ক্রমশ ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের বিকাশের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর, এমন কি প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, সব ধর্মগ্রন্থের স্বরূপই যখন জাগতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ কেন এতোকাল ধরে এগুলোকে অলৌকিক জ্ঞান করে, এবং তার

আত্মপরিচয়ের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে গ্রহন করে চলছে। ব্যক্তি মানুষ এসব ধর্মগ্রন্থ এবং তাদের মধ্যে নিহিত ধর্মগুলোকে জন্মসুত্রে পেয়ে থাকে। আর বাল্যকাল থেকে পারিবারিক শিক্ষা, প্রথাগতশিক্ষা, এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক চাপে সেগুলোকে আত্মস্থ করে ফেলে। ক্রমে একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহার বিধি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অচেতন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আর তা থেকেই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি বহু কৃত্তিম বিভাজনে বিভক্ত হয়ে পরস্পর সংঘাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের দীর্ঘজীবি হবার আরও অনেক কারণ মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে (ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে- অনুলেখক)।

— সমাপ্ত —

পাদটীকা :-

(১) বাইবেল সংক্রান্ত গবেষনা ও পর্যালোচনার ধারাবাহিক ইতিহাসের জন্য দেখুন, The Cambridge History of the Bible, vol.1: Form the beginnings to jerome, ed. P.R. Ackroyd and C.E. Evans, cambridge university press, Cambridge, 1970; vol. 2: The west from the fathers to the Reformation, ed. G.W. Lamp, Cambridge university press, Cambridge, 1969; vol. 3: The west from the Reformation to the present Day, ed. SC. Greenslade, Cambridge University press, Cambridge, 1963. বাইবেল-এর উপর মিশরীয়, সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় এবং গ্রিক প্রভাব, বাইবেল রচনা এবং যিশুর ঐতিহাসিকতা নিয়ে সমালোচনামূলক গবেষনার জন্য দেখুন, James George Frazer, The Golden Bough: A study in Magic and Religion, Macmillan, London, 1957; Albert Schweitzer, The Quest of the Historical jesus, Peter Smith, London, 1911 (first published 1907): Alvin Boyd Kuhn, Who is this King of Glory?, Academy Press, Elizabeth, N.J., 1944; Shadow of the Third Century: A Revaluation of Christanity, Academy Press, Elizabeth, N.J., 1949: A. Robertson, The Origin of Christanity, Lawrence and Winshart, London, 1962; Frederick Engels, "" Bruno Bauer and Early Christanity"" , "" The Book of Revelation"" , and "" On the History of Early Christanity"" in Marx and Engels, On Religion, Progress Publishers, Moscow, 1981.

(২) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Edward Gibbson, The Decline and Fall of The Roman Empire, Chatto and Windus, London, 1960, chs. 20-21; Fredrick Engles, "" On the Early History of Christanity '' op. cit.

(৩) Encyclopaedia of Religion, ed. Mircea Eliade, Macmillan, New york, 1987, Vol. 10, p. 139

(৪) Alfred Guillaume, Islam, Penguin, Harmondsworth, 1954, pp. 57-58; Encyclopaedia of Religion, op. cit., vol. 12, pp. 156-176

(৫) Edward Atiyah, The Arabs, Penguin, Harmondsworth, 1955, p. 31

(৬) Alfred Gillaume, op. cit., ch. 7

অনুলিখন : অনন্ত
০৭-০২-০৫
ananta_atheist@yahoo.com

আরো পড়ুন (অনন্তের পাঠানো মুক্ত-মনায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী)ঃ

- ধর্ম পরিচয় বনাম মানবিক অধিকার রক্ষা (১ম পর্ব| ২য় পর্ব) : ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

Visit: www.mukto-mona.com